শিশুপালনে কোনটি চাই বংশগতি না পারিপার্শ্বিক

অধ্যাপিকা সুবিনীতা ঘোষ

শিশু লালনী গ্রন্থমালা

বাবা-মারা সকলেই প্রতিনিয়ত শিশুকে গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করছেন কিন্তু তাঁদের চেষ্টা-যত্ন সত্ত্বেও প্রায়ই তাঁরা ছোটদের নিয়ে নানান মুস্কিলে পড়েন—এ নিয়ে তাদের মনে নানান জিজ্ঞাসাও জাগে। বাস্তবিকই ছোটদের মনকে খুব ছোটবেলা থেকে ঠিক মত বুঝতে ও পরিচালিত না করতে পারলে, পরবর্তীকালে বাবা-মাদের নানান অসুবিধায় পড়তে তো হয়ই—তা ছাড়াও মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বয়স্কদের মধ্যেও সময় সময় যেসব মানসিক ব্যাধি দেখা যায়, তারও মূল নিহিত থাকে, শিশুকালে মন তার সহজ গতিতে বিকাশ লাভ না করতে পারার মধ্যে। কাজেই শিশুদের সেই বহুবিচিত্র মনের ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অভিভাবকরা যাতে ছোটদের স্বাধীন দেশের উপযোগী সুস্থ ও সবল-মনা প্রয়োজনীয় নাগরিক করে গ'ড়ে তুলতে পারেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে, শিশু লালন ও পরিচালন সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করে, এই পুস্তিকামালা প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে।

শিশু-মনোবিজ্ঞানের মতন একটি জটিল বিষয়কে যাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপন রচনা সম্ভারে সহজ ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার ভার নিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নাই—তাই আশা করি শিশু ও কিশোর কল্যাণকামী মাত্রেই এই প্রচেষ্টাকে সমাদৃত করে তাঁদের সমাদর করবেন।

সম্পাদক

শিশুলালনী গ্রন্থমালা :: দ্বিতীয় পুস্তিকা

শিশুপালনে কোনটি চাই
বংশগতি না পারিপার্শ্বিক

অধ্যাপিকা সুবিনীতা ঘোষ

কিশোর কল্যাণ কেন্দ্র
হাওড়া

ভূমিকা

আজকের দিনে জীবতত্ত্ববিদ্যা বিভিন্ন গবেষণার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। বিজ্ঞান-সম্মত তথ্যাদির ওপর ভিত্তি করেই পুস্তিকাটির বিষয়-বস্তু আলোচনার চেষ্টা করেছি; নানাবিষয়ে যে সব সিদ্ধান্ত পুস্তিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে তা' সাধারণ ভাবে বিষয়-বস্তু বোঝার সাহায্য করবে আশা করি। তবে কোন বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা বোঝার পক্ষে যদি এ আলোচনা যথেষ্ট সাহায্য না করে তাহ'লে তার জন্য বিশেষ আলোচনার দরকার। এই বিশেষ আলোচনা বর্তমান পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য নয়। অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ পুস্তিকাটি পাঠের পর যদি এ বিষয় বিশেষ ভাবে আরও কিছু জানতে চান তাহ'লে এর পরে তা' নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

এই পুস্তিকাটি পাঠের দ্বারা যদি পাঠক-পাঠিকা মণ্ডলীর শিশু-পালন সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান হয় তবে তার জন্য নিজেকে সার্থক-শ্রমা মনে করব।

২২শে পৌষ—১৩৫৭
কলিকাতা

সুবিনীতা ঘোষ

পুনর্মুদ্রণে

এই বইটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন পাঠক সমাজ তা যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ ক'রে এর দ্বিতীয় সংস্করণ করার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দিয়ে অনেক সময় বাধিতও করেছেন আমাকে। কারুর কারুর মতে বইখানিতে অধুনাতম মতবাদ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়নি কিম্বা তাকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। আমার মনে হয় সাধারণভাবে সব মতবাদ নিয়েই অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরে আলোচনা করা হয়েছে সর্বসাধারণের সুবিধের জন্য। কোন মতবাদের সুদীর্ঘ আলোচনা এই বইএর উদ্দেশ্য নয়। বংশগতির মূল বিষয়গুলি মোটামুটিভাবে উল্লেখ করে জীবনের পূর্ণ পরিণতির পথে পারিপার্শ্বিককে কতখানি উন্নত করে তুলতে পারা যায় সেইটেই আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। আশা করি পাঠকপাঠিকারা বইখানি পাঠের সময় সেইভাবেই একে গ্রহণ করবেন।

১লা মাঘ—১৩৫৯
কলিকাতা

—লেখিকা

শিশুপালনে কোনটি চাই—বংশগতি না পারিপার্শ্বিক

বাবা-মার আশা ও হতাশা

দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার আড়ালে একটু লক্ষ্য করলেই যে বিষয়টি সহজেই আমাদের চোখে পড়ে, সে হচ্ছে শিশুর লালনপালন নিয়ে অধিকাংশ পিতামাতার সমস্যা। শিশু একান্ত আপনার, কাজেই তাকে কেন্দ্র করে পিতামাতার আশা-আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই। আমার ছেলে আর পাঁচটি ছেলের মত 'পাস' দেবে, চাকরি-বাকরি করবে, ঘর-সংসার করবে—এ হেন আকাঙ্ক্ষা সকল জনক-জননীই পোষণ করেন। শিশু সম্বন্ধে নিজেদের এই অভিলাষ সামনে রেখেই বাপ-মা শিশুপালনে আপন শক্তি নিয়োজিত করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাপ-মা হয়ত সন্তানের মানুষ হওয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেদের কামনার চরিতার্থতা দেখতে চান—কিন্তু তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আবার অনেক শিশু ঠিক তাঁদেরই মনের মত 'মানুষ' হয় না যে, এমনও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই। ছেলে হয়ত ক্লাসের পরীক্ষায় পাশ করতে পারল না—বাপ ক্রুদ্ধ হলেন—ছেলেকে চোখ রাঙালেন—আরও কড়াক্কড়ি করলেন তার পড়াশুনোর ব্যাপারে। কিন্তু এত কড়াক্কড়ি সত্ত্বেও ছেলে হয়ত তার আর পাঁচজন বন্ধুর মত পরীক্ষার ফল দেখিয়ে বাপ-মাকে খুসি করতে পারলো না। ফলে বাপ-মায়ের অসন্তোষ বেড়েই চল্‌ল—প্রতিকারের কোন উপায় তাঁরা দেখতে পেলেন না। নানাভাবে নিপীড়ন করে শিশুর কাছ থেকে তাঁরা আদায় করতে চাইলেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ত তাতেও কোন লাভ হল না।

এ ত' গেল শিশুর জীবনের এক ধরণের অক্ষমতা। এ ধরণের অক্ষমতা ছাড়াও আর এক ধরণের অক্ষমতা শিশুর মাঝে দেখা যায়, যার

জন্ম সে বাপ-মায়ের কাছে সমস্যার বস্তু হয়ে ওঠে। সে হল তার আচার আচরণ। বাপ-মায়ের রুচি অনুযায়ী সে হয়ত যথেষ্ট সামাজিক নয়—হয়ত একটু নিরীহ ধরণের—অতি মাত্রায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের দরুণ হয়ত একটু বেশী অহঙ্কারী—আর পাঁচজনের সঙ্গে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না কিংবা হয়ত অতি মাত্রায় উদ্ধত; বাইরে বাইরে ছেলের দলের সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে ফিরতে ভালবাসে—অত্যন্ত কলহপ্রিয়—দারুণ স্বার্থপর……ইত্যাদি…ইত্যাদি। সন্তানের এহেন আচার আচরণের জন্য বাপ-মায়ের হয়ত দশজনের কাছে মুখ দেখানোর উপায় থাকে না—এবং যতই তাঁরা দশজনের কাছে মুখ দেখাতে পারেন না—ততই সন্তানের আচরণ সংশোধন করতে তৎপর হন। এর জন্যে প্রথমে হয়ত উপদেশ পরে কাকুতি-মিনতি, উপরোধ-অনুরোধ এবং সর্বশেষে তিরস্কার ও প্রহারের আশ্রয় নেন. কিন্তু তাও যখন নিস্ফল হয়, তখন 'ভগবান ভরসা' বলেই হাল ছেড়ে দেন।

শিশুকে নিয়ে এই যে সমস্যা, এর সমাধান অভিভাবকেরা করতে পারবেন নিজেরাই, যদি তাঁরা এ সম্বন্ধে একটি মূলনীতির বিষয় অবহিত হন। শিশুতে শিশুতে যে ব্যবধান আছে, প্রত্যেক শিশুই যে অন্য শিশুর চেয়ে স্বতন্ত্র, এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলেই তাঁদের পক্ষেও শিশুকে মানুষ করে তোলা সহজ হয়ে পড়বে।

ব্যক্তিগত প্রভেদ কেন হয়?

স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ব্যবধান কেন হয়? বুদ্ধির দিক দিয়ে, বিচারের দিক দিয়ে, আচার আচরণের দিক দিয়ে মানুষে মানুষে কেন এত পার্থক্য? বহুদিন পর্যন্ত এই পার্থক্যের স্বরূপ সন্ধানীর কাছে ধরা পড়েনি। সকলের কাছে সে দাবী করে এসেছে সমান পাওনা—যখন পায়নি তখন উৎপীড়ন চালিয়েছে।

ব্যক্তিগত ব্যবধানের কারণ নির্দেশের বহু পরীক্ষা চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করেছেন যে, বংশগতি এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাবই ব্যক্তিগত ব্যবধানের কারণ।

বংশগতি কি ?

আমরা সকলেই জানি, অন্যান্য প্রাণীর মতনই মানুষের জীবনও সুরু হয় একটি ছোট কোষের মধ্যে দিয়ে। একে বলা হয়ে থাকে জননকোষ বা জীবকোষ। এই জীবকোষের মধ্যেই থাকে ভবিষ্যৎ মানুষের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাগুন সুপ্ত হয়ে। দুইটি নর-নারীর এই জীবকোষের পূর্ণ সংমিশ্রণের সাথে সাথেই একটি শিশুর ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হয়ে যায় চিরকালের জন্য। শিশুটির দৈহিক গঠন কেমন হবে, কোন কোন মানসিক গুণের সে অধিকারী হবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সে দায়িত্বশীল, চরিত্রবান নাগরিক হয়ে উঠবে, না হীনচরিত্র হয়ে সমাজের বোঝা স্বরূপ হয়ে থাকবে, তাও নির্ধারিত হয় বাবা মার জীবকোষের পূর্ণ সংমিশ্রণের সাথে সাথেই। বাবা, মা উভয়ের জীবকোষেই চব্বিশ জোড়া করে বংশসত্বাবাহী কণিকা থাকে। প্রত্যেক জোড়ায় থাকে দুইটি সমজাতীয় অসমধর্মী গুন। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, গান গাইবার ক্ষমতা ও গাইতে না পারার ক্ষমতা। এখন বাপ মায়ের জীবকোষের সংমিশ্রণের কালে যদি এমন ঘটে যে, পুংকোষের সঙ্গীত-ক্ষমতা বিশিষ্ট কণিকা স্ত্রী কোষের সঙ্গীত-ক্ষমতা বিশিষ্ট কণিকাকে স্পর্শ করে, তাহলে সাধারণতঃ শিশুর মধ্যে সঙ্গীত ক্ষমতা বর্তায়। এই যে সঙ্গীত ক্ষমতা এটা শিশু তার জন্মসূত্রেই পায়—এজন্য এ ক্ষমতাকে আমরা জন্মগত বলতে পারি।

আবার এ ক্ষমতা শিশু বংশগতির ফলেও পেতে পারে। ঠাকুর্দা ও ঠাকুরমা উভয়েরই গান গাইবার শক্তির সংমিশ্রণ ঘটলে সে শক্তি

পিতার মধ্যে বর্তাতে পারে। অনেক সময় হয়ত আবার একজনের গান গাইবার ক্ষমতাযুক্ত কণার সঙ্গে অন্যজনের গান গাইতে না পারার ক্ষমতাযুক্ত কণার মিলন ঘটে—কিন্তু এই বিরোধী কণিকার মিলন সত্ত্বেও কখনও কখনও দেখা যায় যে, পিতা সঙ্গীত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। অবিশ্যি কখনও কখনও আবার তিনি সঙ্গীত-ক্ষমতায় বঞ্চিতও হয়ে থাকেন। পাঁচজনের দেখে গান বাজনা তাঁর হয়না। কিন্তু এই সঙ্গীত-ক্ষমতা-হীনতা বাইরের দিক থেকে দেখা গেলেও তাঁর জীবকোষে সেটা ঘুমন্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে। ভবিষ্যৎ জীবনে যখন পিতামাতার জীবকোষের সংমিশ্রণ ঘটে তখন পিতামাতা উভয়ের এই সঙ্গীত-ক্ষমতাযুক্ত কণিকার মিলনের ফলে শিশুর জীবকোষেও সঙ্গীত ক্ষমতা বহন করে আনে।

এই ভাবে শিশু পিতামাতার মধ্যে দিয়ে উর্ধ্বতন পিতৃমাতৃকুলের গুণাগুণ কিছু না কিছু পেয়ে থাকে। সাধারণতঃ এই জন্যেই ঠাকুরমা ঠাকুর্দা, দিদিমা, দাদামশাই বা আরও দূরতর পূর্বপুরুষের সাথে আমরা কোন একটি শিশুর মিল সময় সময় দেখতে পেয়ে থাকি। বংশানুক্রমে সন্তানের মধ্যে এইভাবে দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতির গুণাগুণ বর্তানোকেই আমরা 'বংশগতি' বলতে পারি। এইসব গুণাগুণ হয়ত দু'এক পুরুষে চাপা পড়ে গিয়ে দেখা নাও যেতে পারে। তবে সাধারণতঃ বংশগতির অর্ধেক ধারাই শিশু তার বাবা মার কাছ থেকে পায়। ঠাকুর্দার কাছ থেকে পায় মাত্র চার ভাগের এক ভাগ আর প্রপিতামহদের কাছ থেকে আট ভাগের এক ভাগ। এমনি করেই মানুষের জীবনে সুদূর অতীত কাল থেকে বংশগতির ধারা বয়ে চলে।

শিশু পালনে বংশগতির স্থান

জন্মগতি ও বংশগতির ফলে কিভাবে শিশু তার পিতামাতার গুণাগুণের অধিকারী হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে আমরা পরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করব। এখন দেখা যাক বংশগতি কিভাবে শিশুর জীবনকে প্রভাবান্বিত করে।

শিশু খালি দেখতেই তার বাবা মা'র মতন হয় না, তাঁদের বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা, পছন্দ-অপছন্দ, চরিত্র, অভ্যাস ইত্যাদিরও উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। বংশগতিবাদীরা মনে করে থাকেন যে, শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তিগুলিই তার জীবন গঠনে প্রধান অংশ নিয়ে থাকে ; তার এই শক্তিগুলিই আসলে ঠিক করে দেয় যে, শিক্ষার দ্বারা শিশুকে কতখানি গড়ে তোলা যাবে। তাঁদের মতে, সকল শিক্ষালাভেরই একটা সীমা বা ক্ষমতা আছে—সেই সীমা বা ক্ষমতা নির্ভর করে শিশুর উত্তরাধিকারীসূত্রে বিশেষ শক্তি লাভ করার ওপরে। এই সব শক্তি শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনি বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে—এ বিষয়ে পারিপার্শ্বিক শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।

এই ভাবে বংশগতিবাদীরা শিশু পালনে পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজনীয়তা একেবারে উপেক্ষা করে থাকেন। শিবাজী, বাবর, বিদ্যাসাগর, রাজেন মুখার্জী, টমাস এডিসন্ ইত্যাদির কাহিনী উল্লেখ করে তাঁরা বলেন যে, তাঁদের মধ্যে শক্তি নিহিত ছিল বলেই না তাঁরা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও মানুষের মতন মানুষ হয়েছিলেন। কাজেই পারিপার্শ্বিক কিছুই নয়—জাহাজের পক্ষে স্রোত ও বায়ুর প্রয়োজন যতখানি, মানুষের পক্ষে পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজনও ততটুকু। পরিবেশ নিহিত শক্তি জাগিয়ে তোলে মাত্র—সৃষ্টি করে না। ঐ একই ধরণের অবস্থার মধ্যে তো কত শত বালককে নিত্য মানুষ হতে দেখা যায়, কই সবাই তো শিবাজী বা টমাস এডিসন্ হয়ে ওঠে না ; বরং জীবন যুদ্ধে তারা সবাই হেরেই যায়। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও কেউ যদি

মানুষের মতন মানুষ হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, এর মূলে রয়েছে অন্তর্নিহিত সেই সব শক্তি, যা শিশু তার বাবা মার কাছ থেকেই বংশানুক্রমে পায়।

বংশগতিবাদের পৃষ্ঠপোষকরা শুধু যে নামকরা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের জীবন আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন তা নয়, তাঁরা সমাজের অনেক নিম্নস্তরের পারিবারিক ইতিহাস ঘেঁটেও দেখেছেন যে, তাদের মধ্যে খুনী, চোর, ডাকাত, শিশুমৃত্যু ইত্যাদির ধারা বংশানুক্রমে বেশ ভালো রকমেই বয়ে চলেছে। কাজেই তাঁরা বংশগতির ওপর জোর দেন আর বলেন যে, শিক্ষা কিছু নয়—আসলে ওটা এক রকমের রঙীন প্রলেপ ; বাইরেটাকেই খালি চক্‌চকে করে তোলে, ভেতরে কাঠামোকে বদ্‌লাবার তার কোন ক্ষমতা নেই।

মানুষে মানুষে যে ভেদ আছে, সে ভেদের কারণ বংশগতিবাদীরা এইভাবে বংশগতির ধারার বিভিন্নতা দিয়েই দেখিয়ে দিতে চান। তাঁদের এই ব্যাখ্যা কিন্তু সবাই মেনে নিতে রাজী নন। যাঁরা পারিপার্শ্বিককেই—অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষা, সুযোগ-সুবিধাকেই ব্যক্তির জীবন গঠনের একমাত্র মালমশ্‌লা ভাবেন, সেই পারিপার্শ্বিকবাদীরা বলেন, মানুষে মানুষে যে বিভিন্নতা দেখা যায়, তার কারণ রয়েছে মানুষকে যে বিভিন্ন শিক্ষা-দীক্ষা ও সুযোগ-সুবিধার মধ্য দিয়ে বড় হতে হয় তারই মধ্যে। তাঁদের মতে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিও যেমন তার শিক্ষা আর পারিপার্শ্বিকের ফল-স্বরূপ, একজন সাধারণ বোকাসোকা মানুষও ঠিক তাই।

পারিপার্শ্বিকের দাবী

পারিপার্শ্বিকবাদীদের মতে, শিশুকালে মানুষের মন থাকে কাদার মতন নরম। পারিপার্শ্বিকই তাকে ইচ্ছামতন গড়ে তোলে। তাঁরাও ঠিক

ঐ শিবাজী, বাবর ইত্যাদির নজির দেখিয়ে পাল্টা চাপান দেন যে, এঁরা বড় হয়েছিলেন ঠিক, কিন্তু কই তাঁদের উর্ধ্বতন বা অধস্তন, পুরুষদের তো অতখানি প্রতিভার অধিকারী হয়েছেন, বলে দেখতে পাই না। অতএব, আমরা কি তাহলে এই সিদ্ধান্ত করতে পারি না যে, ঐসব ব্যক্তিরা আসলে হচ্ছেন সেই সময়কার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেশের ফল-স্বরূপ? অন্য কোন বিরুদ্ধ অবস্থায় পড়লে নিশ্চয়ই তাঁদের সেই অসামান্য প্রতিভার স্ফুরণ হতো না। মানুষের পরিবেশ শিক্ষা, দীক্ষা তাকে যেমন ভাবে গ'ড়ে তোলে, সে তেমনি ভাবে মানুষ হয়ে ওঠে। শিক্ষাই হলো মানুষের নৈতিক ও মানসিক সমৃদ্ধির হেতু।

মনে করা যাক সেই আদিম যুগের কথা—যখন মানুষ একরকম পশু বই আর কিছু ছিল না—তখন তার বুদ্ধিও ছিল সামান্য। তার তখনকার জীবনযাত্রার কথা ভাবলেও আজ অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে, কেমন করে সে জীবন-সংগ্রামে টিকে ছিলো। যদি বংশানুক্রমে সেই আদিম মানুষ তার সেই আদিম গুণগুলিই আমাদের মধ্যে দিয়ে যেতো, তাহলে নিশ্চয়ই আজ আমরা মানুষ হিসাবে এত বড় সভ্যতার অধিকারী হতে পারতাম না—গড়ে তুলতে পারতাম না কিছুতেই, আজকের দিনের এই সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা, শিল্প ও সমাজকে। এ কেবল সম্ভব হয়েছে মানুষের জ্ঞান, চিন্তা, শিক্ষা, অভ্যাস, অভিজ্ঞতার ফলেই। আজ যদি মানুষের চারপাশ থেকে তার সভ্যতার পরিবেশ ছিনিয়ে নিয়ে, তাকে আদিম সহজাত বুদ্ধি সম্বল করে চলতে দেওয়া হয়, তাহলে পণ্ডিতেরা কল্পনা করেন যে, মানুষের শতকরা নিরানব্বই জনই ছ'মাসের মধ্যে যাবে ধ্বংস হয়ে।

মানুষের জীবনে শিক্ষা বা পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি, তা নতুন চীনের ও জাপানীদের জাতি হিসাবে অগ্রগামিতা দেখে কতকটা অনুমান করা যেতে পারে। সুশিক্ষা ও পরিবেশের ফলে কত বিপথগামী

শিশুকে যে সুপথে চালনা করা হয়েছে তার উদাহরণ পাঠকদের হয়তো অবিদিত নেই। কাজেই শিশুর জীবন গঠনে পারিপার্শ্বিকের দাবীকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। তাই পারিপার্শ্বিকবাদীদের মত যে—মানুষের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় তার পারিপার্শ্বিকের প্রভাবেই। বংশগতি তার অকিঞ্চিৎকর ছায়া মাত্র।

কোনটি বেশী প্রয়োজনীয়—বংশগতি না পারিপার্শ্বিক ?

এই প্রশ্ন তোলাও যা আর আপনার কোন পা বেশী দরকারী—ডান না বাঁ ? এ জিজ্ঞাসা করাও তাই। তবুও বংশগতিবাদী ও পারিপার্শ্বিকবাদীদের কথা যখন আলাদা আলাদা ভাবে চিন্তা করি, তখন মনে হয়, প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষেত্রে তাঁরা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু একটু ভাবলেই আমরা দেখতে পাই যে, শিশুর সমগ্র জীবন গঠনে বংশগতি বা পারিপার্শ্বিক পরস্পর বিরোধী নয় বা তারা বিচ্ছিন্ন ভাবেও অবস্থান করে না বরং দুইয়ের যোগাযোগের ফলেই শিশুর জীবনে পূর্ণতা আসে।

বংশগতি ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে যাবে, যদি আমরা একটি গাছের জন্ম-কথা মনে করি। গাছটির জন্মানো, বড় হওয়া, ফল দেওয়া সব কিছু নির্ভর করে, তার বীজ ও ক্ষেত্রের ওপর—নয় কি ? বীজের মধ্যে একটি বিশেষ গাছ জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে সত্য, কিন্তু কেমন করে বা কত ভালো ভাবে তা বাড়তে পারবে, তা নির্ভর করে যে জমিতে গাছ জন্মায় তার ওপর। যদি বীজটি অস্থানে পড়ে, তা হলে তার থেকে অঙ্কুরোদ্‌গম না হবারই সম্ভাবনা। আবার যদি কোন অনুর্বর মাটিতে বা খুব বেশী রোদে-জলে বীজটি পড়ে, তাহলে তার থেকে অঙ্কুরোদ্‌গম হলেও, চারা গাছটির বেঁচে থাকা বা ফুল-ফল দেওয়ার আশা খুবই কম। কিন্তু বীজটির পক্ষে ক্ষেত্র যদি

ভালো হয় ; সে যদি অনুকূল রোদ, জল, সার পায়—তা হলে তার থেকে কালে একটি ফলবান বৃক্ষ আমরা আশা করতে পারি। তাহলে আমরা দেখেছি যে, গাছের পক্ষে বীজ ও জমি দুয়েরই প্রয়োজন আছে। ঠিক এইভাবে দেখতে গেলে মানুষের বেলাতেও বংশগতি ও পারিপার্শ্বিক উভয়েরই প্রয়োজন অনিবার্য।

আমরা আগেই দেখেছি যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রত্যেক শিশুই তার ভবিষ্যৎ জীবনের কতকগুলি বিভিন্নমুখী সম্ভাবনা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। সে সম্ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের সহায়তায়। যার মধ্যে সম্ভাবনা থাকে যত বেশী, ভবিষ্যৎ জীবনে তাকেই দেখা যায় তত বেশী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হতে—উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক তার সম্ভাবনাকে পুষ্পিত হয়ে উঠতে পথ করে দেয় মাত্র। সম্ভাবনা যেখানে অল্প, সেখানে পারিপার্শ্বিক যথেষ্ট সমৃদ্ধ হলেও ইচ্ছানুরূপ ফল দিতে পারে না। আবার পারিপার্শ্বিক যথোপযুক্ত না হলেও নিহিত সম্ভাবনা বিকাশ লাভের অবকাশ পায় না। কাজেই সমগ্রের দৃষ্টিতে দেখলে বংশগতি ও পারিপার্শ্বিক উভয়েই সমভাবে শিশুর জীবন গঠনে সাহায্য করে সন্দেহ নেই। তাই বলা হয়—**প্রত্যেক মানুষই তার জন্মসত্ত্বা ও জীবন পরিবেশের ফলস্বরূপ।**

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পেরেছি যে, একটি শিশু সমাজে কত বড় স্থান অধিকার করবে, তা ঠিক জানতে হলে, আমাদের তার বংশগতি আর পারিপার্শ্বিক দুয়ের ওপরই নজর দিতে হবে। এখন আরও বিশেষ ভাবে আলোচনা করে দেখা যাবে কি ভাবে এই দুটি ধারা মানুষের জীবনকে প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্নভাবেই বা কতখানি নিয়ন্ত্রিত করছে আর সমগ্র জীবন গঠনের পক্ষেও এদের সম্মিলিত দানই বা কতটুকু !

বংশগতি সূত্রে প্রাপ্য দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য

দৈহিক বৈশিষ্ট্য

আমরা আগেই বলেছি দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাগুণ শিশু বেশীর ভাগই পায় সমানভাবে তার বাবা-মার কাছ থেকে। যে গুণটি বাবা-মা উভয় বা উভয় পরিবারের মধ্যে বর্তমান থাকে, সেই গুণটি শিশুর মধ্যেও বর্তানোর সম্ভাবনা খুব বেশী মাত্রায় থাকে। এইসব গুণগুলি সমজাতীয়—সমধর্মী হতে পারে; আবার সমজাতীয়—অসমধর্মীও হতে পারে। যেমন বাবা, মা উভয়েই যদি দীর্ঘকায় হন, তবে সাধারণতঃ শিশু উভয়ের কাছ থেকেই এই লম্বত্ব গুণটি পাবে, এবং পরিণামে সে লম্বাই হবে। কিন্তু যদি বাবা অপেক্ষাকৃত খাটো আর মা লম্বা হন, তাহলে বাপ-মায়ের এই সমজাতীয় অসমধর্মী গুণের জন্য শিশু হয়তো বাবার মতই খাটোই হবে—কিন্তু তার মধ্যে মায়ের লম্বা ভাবটিও রয়ে যাবে ভালোভাবেই। ভবিষ্যতে যদি সেই শিশুর কোন লম্বা মেয়ের সাথে বিয়ে হয়, তাহলে সন্তানেরা লম্বাই হবে। তেমনি গায়ের রঙের বেলায় যদি বাপ কালো আর মা ফর্সা হয়, তা হলে শিশুর গায়ের রং সাধারণতঃ ফর্সাই হবে—যদিও তার মধ্যে কালো ভাবটা থেকেই যাবে। চোখের রঙের বেলায়ও দেখা যায়, শিশু সাধারণতঃ বাপের চোখের রঙেরই অধিকারী হবে। বাপের চোখের রঙ যদি কটা, আর মায়ের চোখের রঙ কালো হয়, তাহলে শিশুর চোখের রঙ কটাই হবে—যদিও তার ভেতরে চোখের কালো রঙের ভাবটা থেকে যাবে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, বাপ-মায়ের গুণ যদি অসমধর্মী হয় তাহলে তার মধ্যে একটি প্রবল এবং অন্যটি দুর্বল অবস্থায় থাকে। যেটি প্রবল হয় সেটিই শিশুর মধ্যে প্রকাশ পায় এবং যেটি দুর্বল হয় সেটি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বাবার গুণটিই হয় প্রবল—কখনও কখনও মায়ের গুণটিই প্রাধান্য লাভ করে। তবে এ নিয়ম সব ক্ষেত্রে খাটে না।

বংশগতিতে শুধু যে প্রবল গুণটি প্রকাশ পায় এমন নয়, অনেক সময় সঙ্করত্বও দেখা যায়। যেমন—বাবা-মার মধ্যে একজন কালো হলে, অনেক সময় সন্তানের রঙ এমন হয় যাকে কালো বা ফর্সা বলা চলে না। এ সঙ্করত্ব শুধু বর্ণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না—দৈহিক গঠন, আচার আচরণের মধ্যেও সংক্রামিত হয়।

মানসিক বৈশিষ্ট্য

বংশানুক্রমে শিশু বাবা-মার বুদ্ধির অধিকারী হয় কি না, এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। অনেকে অনেক পরীক্ষা করে বলেছেন যে, বুদ্ধিবৃত্তি গঠনে বংশগতি ও পারিপার্শ্বিক দুয়েরই হাত আছে। তবে হীনবুদ্ধির দিক দিয়ে এইটুকু বলা যেতে পারে যে—

(১) বাবা-মা দুজনেই সাধারণ বুদ্ধির অধিকারী হলে, শিশু প্রায়ই সাধারণ বুদ্ধির অধিকারী হয়।

(২) কোন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি (ব্যক্তি অর্থে, স্ত্রী বা পুরুষ যে কেউ), অন্য এক হীনবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি বা ঐরূপ পরিবারের কোনও সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন, তাহলে তাঁদের সন্তান সন্ততির সকলের সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা থাকলেও, তাদের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে কয়েকজন হীনবুদ্ধি-দোষ বহনের অধিকারী হয়। অর্থাৎ তাদের মারফৎ পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে হীনবুদ্ধি সংক্রামিত হতে পারে।

(৩) মা হীনাবুদ্ধি হলে, অর্ধেক সন্তানই হীনবুদ্ধি হয়।

(৪) সাধারণবুদ্ধি সম্পন্না মা, হীনবুদ্ধি ঘরের মেয়ে হলে, তার চারিটি সন্তানের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে একটি হীনবুদ্ধি-দোষের বাহক হয়।

(৫) বাবা মা দুজনেই আপাত দৃষ্টিতে হীনবুদ্ধি-দোষ মুক্ত হলেও দুজনেই যদি হীনবুদ্ধি বংশের সন্তান হয়, তাহলে তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের চারজনের মধ্যে একজন হীনবুদ্ধি-দোষযুক্ত হবে।

(৬) বাবা মা দুজনেই হীনবুদ্ধি-দোষযুক্ত হলে, প্রত্যেক শিশুই হীনবুদ্ধি হয়।

কয়েকটি পরিবারের মানসিক বৈশিষ্ট্যের ইতিহাস

বুদ্ধিমত্তা, সঙ্গীতকুশলতা, গায়ের চামড়ার রঙ, কিম্বা সুনীতি বা দুর্নীতি পরায়ণতার দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে দেখা যায়, সেখানে সন্তান পিতামাতার গুণদ্বারা প্রায় সমানভাবেই প্রভাবান্বিত হয়। পিতা যদি বুদ্ধিমান হন আর মাতা যদি বুদ্ধিহীনা হন, তাহলে সন্তান যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয় না। সন্তানের সঙ্গীতকুশলতা এবং চামড়ার রঙের বেলাতেও একথা খাটে। চারিত্রিক সুনীতি বা দুর্নীতিও অনেকখানি নির্ভর করে বুদ্ধির মাপের ওপরে। কয়েকটি পারিবারিক ইতিহাস আলোচনা করেই বিশেষজ্ঞেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

একজন প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ ৯৭৭টি বিশিষ্ট পরিবারের ইতিহাস আলোচনা করে প্রকাশ করেন যে, এই সমস্ত পরিবারের আত্মীয় স্বজন সকলেই সম্ভ্রান্ত ছিলেন। পুরুষানুক্রমে এঁদের সন্তান সন্ততিরাও সমাজে জ্ঞানী, গুণী বলে স্বীকৃত হয়ে এসেছেন। মাতৃ এবং পিতৃকুলের দিক দিয়ে বুদ্ধির মান এঁদের সকলেরই উন্নত হওয়ায়, এঁরা প্রত্যেকেই বিদ্যা ও বুদ্ধির অধিকারী হন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, দেশের শাসন ব্যবস্থায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন।

পিতা বা মাতা স্বল্পবুদ্ধির অধিকারী হলে সন্তানের ওপর তার প্রভাব কিরকম হয় সে সম্বন্ধেও গবেষণা হয়েছে। ক্যালিকক্ পরিবারের ইতিহাস আলোচনা কালে এক চমকপ্রদ তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তথ্যটিতে জানা যায় যে, এই পরিবারের মার্টিন ক্যালিকক্ নামে এক ব্যক্তি প্রথমে বিবাহ করেছিলেন একটি স্বল্পবুদ্ধি বালিকাকে। সেই বিবাহের ফলে যে উত্তরাধিকারীদের ইতিহাস পাওয়া যায়

তা হচ্ছে মোটামুটি এই : পরিবারের ৪৮০ জন উত্তরাধিকারীর মধ্যে ১৪৩ জন স্বল্পবুদ্ধি, ৪৬ জন স্বাভাবিক, ৩৬ জন অবৈধ, ৩৩ জন অবৈধভাবে যৌনাসক্ত, ২৪ জন মদ্যপায়ী, ৩ জন সন্ন্যাসরোগাক্রান্ত, ৩ জন খুনে, ৮ জন অবৈধাগার পরিচালক এবং ৮৩ জন অতি শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরে মার্টিন ক্যালিকক্ ভাল পরিবারের একটি বুদ্ধিমতী মহিলাকে বিবাহ করেন। সেই বিবাহের ফলে ৪৯৬ জন উত্তরাধিকারীর বিবরণ পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে অনেকেই জীবনে ডাক্তার, প্রফেসর, ব্যবহারজীবী, বড় ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রেসিডেন্ট, গভর্ণর ইত্যাদি হয়েছিলেন।

যমজ শিশুর উপর বংশগতির প্রভাব

শিশুর জীবনের ওপর বংশগতির প্রভাব পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে খানিকটা বোঝা গেল। যমজ সন্তানদের জীবন আলোচনা করেও এ প্রভাব খানিকটা নির্ধারিত হয়েছে। যমজ সন্তান দু'রকমের হ'তে পারে। অভিন্ন ও ভ্রাতৃস্থানীয়। যেসব সন্তান একই জীবকোষ থেকে আসে তাদের অভিন্ন-যমজ বলা হয়, আর যারা বিভিন্ন জীবকোষ থেকে আসে, তাদের ভ্রাতৃস্থানীয় বলা যেতে পারে। এই ধরণের যমজসন্তানদের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে রেখে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে, সম-জীবকোষ থেকে যাদের জন্ম, তাদের পরস্পরের মধ্যে মিল, অসম জীবকোষ-থেকে যাদের জন্ম তাদের চেয়ে ঢের বেশী।

সম-জীবকোষজাত যমজ সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাদের দৈহিক উচ্চতা, ওজন ও উত্তাপ, চুলের রঙ, চোখের রঙ, চামড়ার রঙ, কাণের গড়ন, নাকের গড়ন, দাঁতের সারি, হাতের আঙুল, নখ ইত্যাদি একই ধরণের হয়। তাদের দাঁত ওঠে একই সময়ে; দেহের বিভিন্ন অস্থির বৃদ্ধিও হয় একই সময়ে। তাদের

শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়া একইরূপ হওয়ায় একজনের কোন রোগের যদি ছোঁয়াচ লাগে তাহলে অন্যজনেরও ছোঁয়াচ লেগে থাকে। এদের ভাষার ওপর দখল, হাতের লেখা এবং পড়াশুনা একই প্রকারের হয়। এমন কি মানসিক দুর্বলতা যদি একজনের থাকে—তবে অপরেরও তা দেখা যায়। শ্যামদেশীয় এজাতীয় যমজ সন্তানদের পরীক্ষা করে যা দেখা গেছে—তা সত্যি আশ্চর্য। তারা ছিল দুই বোন—বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে মানুষ হয়েছিল। কিন্তু তাদের একই সময়ে দাঁত ওঠে, তারা একই সময়ে বসতে, হাঁটতে, এবং কথা কইতে শেখে। তারা দু'জনেই ছিল ভারী সঙ্গীতপ্রিয়, বাচাল এবং লঘু প্রকৃতির এমন কি একই দিনে তাদের বিবাহও হয়েছিল। শেষে দেখা যায় একই দিনে তারা সংসার পরিত্যাগ করে আশ্রমবাসিনী হয়েছিল। তাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ে এই যে মিল এইটেই প্রমাণ করিয়ে দেয় যে, তারা একই উপাদানে তৈরী এবং তাদের পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিকাশ একই ভাবে হয়েছে।

আবার বহুকাজ না পারা যে সব সময়েই শিক্ষার ওপর নির্ভর করে না—দৈহিক বৃদ্ধিও যে তার জন্যে যথেষ্ট দায়ী—এ সম্বন্ধেও পরীক্ষামূলক ভাবে জানা গেছে। একবার দুটি ছোট যমজশিশুকে সিঁড়িতে চড়া শেখানো হচ্ছিল। কি করে সিঁড়িতে চড়তে হয় তা এরা কেউই জানে না। এদের মধ্যে একজনকে ছয় সপ্তাহ ধরে কিছুক্ষণের জন্যে সিঁড়িতে চড়া শেখানো হ'ল। অন্য জনকে কিছুই শেখানো হ'ল না। পরে উভয়কেই পরীক্ষা করা হ'ল—এবং বলাবাহুল্য শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশুটিই এ পরীক্ষায় দক্ষতা অর্জন করলে। দ্বিতীয় শিশুটিকে নিয়ে চেষ্টা চলতে লাগলো—কিন্তু সিঁড়ির একটি ধাপও সে উঠতে পারলো না। আশ্চর্যের বিষয়, এক সপ্তাহ পরে কিন্তু দেখা গেল যে, শিশুটি নিজেই সিঁড়ির ওপরের ধাপে উঠে বসে আছে; কাজে কাজেই

পিতামাতার মানসিক বৈশিষ্ট্য ও সন্তানের উপর তাহার ফলাফল

পিতা	মাতা	=	উন্নত বুদ্ধি শিশু	সাধারণ বুদ্ধি শিশু	স্বল্প বুদ্ধি শিশু	হীন বুদ্ধি শিশু	শিশুর মোট সংখ্যা
সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন	সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্না	=	৭	১১০	১৩	৪৯	১৭৯
সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন	স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্না	=	×	১৭	১৩	১৩	৪৩
স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন	সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্না	=	×	১৯	৭	১১	৩৭
সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন	হীন বুদ্ধি সম্পন্না	=	×	১১	১৪	২০	৪৫
স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন	হীন বুদ্ধি সম্পন্না	=	×	×	১	১৮	১৯
হীন বুদ্ধি সম্পন্ন	স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্না	=	×	×	×	৪	৪
স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন	ঐ	=	×	৮	১২	১৭	৩৭
হীন বুদ্ধি সম্পন্ন	হীন বুদ্ধি সম্পন্না	=	×	১	৩	১৮	২২

এই যে পারা না পারা, সেটা যত না নির্ভর করছে শিক্ষার ওপর তারচেয়েও বেশী নির্ভর করছে দৈহিক বৃদ্ধির ওপর। দৈহিক বৃদ্ধি যেদিন পূর্ণতা লাভ করল—সেদিনই সে আপনা থেকেই সিঁড়ির সবগুলো ধাপ চড়ে ফেল্‌লো।

পিতা-মাতার মানসিক বৈশিষ্ট্য সন্তানে যে কতখানি বর্তায়, ১৯৪টি পরিবারের ইতিহাস আলোচনা করে তার যে ফল পাওয়া গেছে তা এখানে (১৫ পৃষ্ঠায়) দেওয়া গেল। কৌতূহলী পাঠক এর থেকে নিজের মতামত ঠিক করে নিতে পারেন।

অর্জিত গুণ কি সন্তানে বর্তায় ?

এই জিজ্ঞাসা প্রায়ই আমাদের মনকে উতলা করে তোলে। আর আমরাও সাধারণতঃ ভাবি যে, পিতামাতা যদি কোন বিশেষ গুণ অর্জন করে থাকেন, তবে সন্তান নিশ্চয়ই তার অধিকারী হবে। যেমন, অনেকে ধারণা করেন যে, ডাক্তারের ছেলে বুঝি ডাক্তার হবেই। রাঁধায়-পটু বা সেলাই-পটু মার মেয়ে ভালো রাঁধুনি বা সেলাই-পটু হবেই—এ ধারণা করা ভুল। কোন শিশুই রাঁধবার, সেলাই করবার বা বিশেষ দক্ষতাপূর্ণ কাজ করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না। চীনদেশে সুন্দরী হবার জন্য মেয়েদের পা বেঁধে বিকৃত করার প্রথা অনেক দিন থেকে প্রচলিত ছিল কিন্তু এর জন্যে কোন শিশুই বিকৃত পা নিয়ে জন্মায় নি। যখন আমরা বলি যে, অমুক শিশুটি জন্মকবি, বা জন্মশিল্পী, তার মানে আমরা এই বুঝি যে, শিশুটির মধ্যে কবি, বা শিল্পী হবার সম্ভাবনা সহজাত রয়েছে, উপযুক্ত সুযোগ পেলেই তা সহজেই বিকশিত হবে।

অজিত গুণ সন্তানে বর্তায় না, একথা যদিও দুঃখের, তবে এ দুঃখের মাঝে এ কথা জেনে সুখ আছে যে, দৈব দুর্বিপাক বা রোগবশতঃ যে সব দৈহিক দোষ অজিত হয়, তা সন্তানে বর্তায় না। খোঁড়া বাবার সন্তানরা

খোঁড়া হয় না বা অন্ধ মায়ের মেয়ে অন্ধ হয় না। তবে কয়েক শ্রেণীর দুষ্ট রোগ আছে, তারা ভবিষ্যৎ সন্তানের মাঝেও রোগ বহন করে আনে; তাও হয় কারণ, রোগের বিষাক্ত কলঙ্ক জীবকোষে ছড়িয়ে পড়ে বলেই।

বংশগতি জানার প্রয়োজনীয়তা

এতক্ষণ বংশগতির বিভিন্ন দিক আমরা এইজন্যেই আলোচনা করলাম যে, শিশুকে মানুষ করে তুলতে হলে, তার মধ্যেকার নিহিত শক্তিগুলিও জানা দরকার। উপাদান ভাল না হলে, তা দিয়ে ভাল জিনিস তৈরী করা যায় না। যে শিশুর মাঝে শিল্পীর প্রতিভা নেই, তাকে ছবি আঁকা শেখাবার জন্য যদি হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা হয়, তা হলে তাতে কোনদিনই ফল দর্শাবে না। সুপ্ত শক্তিকেই শিক্ষা জাগ্রত ও বিকশিত করে মাত্র। আমাদের বংশগতি যে আমাদের মানসিক শক্তিকে একটা নির্দিষ্ট সীমায় বেঁধে রেখেছে, শিক্ষার দিক দিয়ে একথা ভুললে চলবে না। তাই বলে আমাদের হতাশ হবারও কিছু নেই। জগতে সর্বস্তরের মানুষেরই স্থান আছে। পিতামাতার তাই কর্তব্য, প্রত্যেক শিশুর বংশগতির ধারা, সম্ভাবনা ও নিহিত শক্তির নির্ণয় করা এবং শিশুর মধ্যে যা কিছু সুন্দর স্ফুটনোন্মুখ হয়ে আছে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করে তাকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করা।

ব্যক্তিগত দিক দিয়েও আমাদের নিজের নিজের বংশগতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এ জ্ঞান শুধু নিজের আত্মশক্তি সম্বন্ধে নিজেকে সচেতন করে তোলে না, পরবর্তীকালে অনেক হতাশার থেকেও আমাদের বাঁচায়।

এছাড়াও স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, উন্নততর ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনেও আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। সেই ভাবী সমাজের দিকে দৃষ্টি রেখে, আমরা যদি বিবাহ ব্যাপারে এই জ্ঞানকে কাজে লাগাই, তবে

বংশানুক্রমে সন্তানের মাঝে যে দোষ বর্তাবার সম্ভাবনা থাকে, তার থেকে ভবিষ্যদ্বংশীয়দের অনেক পরিমাণে মুক্তি দিতে পারি। একথা আমাদের কোনক্রমেই ভুললে চলবে না যে, মানুষের সবলতা ও দুর্বলতা দুই-ই বংশানুক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষে পর্যন্ত বর্তায়। এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে, "উন্নত বংশধারা অমূল্য সম্পদ।"

জাতীয় বংশগতি

পারিবারিক গুণাগুণের উত্তরাধিকারী হওয়া ছাড়াও শিশু আরেক রকম সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়; সে হচ্ছে জাতীয় উত্তরাধিকার। জাতীয় উত্তরাধিকারসূত্রে শিশু পায় তার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে সমাজ, দর্শন, কলা, সাহিত্য, আইন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি নানান কিছু। এর দ্বারা শিশু একটা জাতির সমগ্র অতীতের উত্তরাধিকারী হয় এবং নিজেকে সেই অর্জিত গুণের প্রভাবে লাভবান ক'রে তোলে। যুগ-যুগ ধরে, সমাজ বা জাতি, তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যে সভ্যতা ও কৃষ্টির অধিকারী হয়, তাকেই বলা হয় "জাতীয় বা সামাজিক বংশগতি।" আমাদের তাই সমাজকে এমন ভাবে গড়ে তোলা উচিত যেখানে জাতির ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা অতীতের ঐশ্বর্যে লাভবান হয়ে, সর্বতোভাবে আপন শক্তিমত নিজেদের ফুটিয়ে তুলতে পারে।

পারিপার্শ্বিক ও শিশু

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শিশুর জীবনে তার বংশগত প্রভাবের বিষয় আলোচনা করেছি। এখন দেখা যাক শিশুর পারিপার্শ্বিক বলতে আমরা যথাযথ কি বুঝি এবং শিশুর জীবনে তার প্রভাবই বা কতখানি?

আমরা জানি দুইটি জীবকোষের সংমিশ্রণের সাথে সাথেই, শিশুর ভবিষ্যতের আশা, সম্ভাবনা সব কিছু চিরকালের জন্য স্থির হয়ে যায়। কিন্তু জন্মাবার পরমুহূর্ত থেকেই অন্য রকমের বাইরের প্রভাব শিশুর ওপর

কাজ করতে থাকে, যার ফলে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। এই প্রভাবগুলি মনের ওপরই কাজ করে বেশী। যে প্রভাবগুলি শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ প্রকাশের পথে নিয়ে যায়, তাই শিশুর পারিপার্শ্বিক।

যে সম্ভাবনা নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করে তার বিকাশ নির্ভর করে এই অনুকূল বা প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের ওপর। জন্মের অতি শৈশবে, মানুষের শিশু, জন্তু জানোয়ারের চেয়েও অসহায়—অন্যের সাহায্য ছাড়া তার বাঁচবার আশাই থাকে কম। শিশুর এই অসহায় অবস্থা চলে বেশ কয়েক বছর ধরে। এই কয়েক বছরের মধ্যে শিশুকে বাঁচবার জন্যে যে অবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়, সেই অবস্থা শিশুর ওপর প্রচণ্ডভাবে প্রভাব বিস্তার করে ও তাকে একটি বিশিষ্ট ধরণের পূর্ণ বয়স্ক মানুষ হবার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই সব প্রভাবের মধ্যে, ঈপ্সিত ফল লাভের আশায় কতগুলিকে ইচ্ছাপূর্বক শিশুর জীবনের উপর বিস্তার করা যায়। অন্য প্রভাবগুলি কোনটা দৈবাৎ ঘটে, কোনটা অনিচ্ছাপূর্বক আসে এমন কি কোনটা অজান্তেই ঘটে যায়। আর এইটাই সকলের বেশী করে মনে রাখা উচিত যে, পরিণত বয়সের চেয়ে বাল্য বয়সের পারিপার্শ্বিক প্রভাবই শিশু মনের উপর বেশী কাজ করে থাকে। যদিও বিশেষ পর্যবেক্ষণের দ্বারাই এই সত্যের যথাযথ তথ্য নির্ণয় হয়েছে, তবুও এই সাধারণ নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটে থাকে।

একই পরিবারে দুইটি শিশু বিভিন্ন রকমের হয় কেন?

অনেকেই মনে করেন যে, যেহেতু বিভিন্ন শিশু একই পরিবার ও একই রকম অবস্থার মধ্যে বাস করে, সেই হেতু তাদের পারিপার্শ্বিকও একরকম। কাজেই একই পরিবারে দুইটি বিভিন্ন শিশুকে বিভিন্ন প্রকারের হতে দেখলে তাঁরা আশ্চর্য হন। কিন্তু অভিভাবকদের শিশু লালনের সময় এই কথাটা জানা দরকার যে, দুইটি শিশুর সামাজিক পরিবেশ (যমজ

ছাড়া) কখনও এক হয় না। পরিবারে শিশুর স্থান অনুযায়ী সামাজিক পবিবেশেরও বদল হয়। একই পরিবারের বড়ো, মেজো, সেজো, ছোটো পরস্পরের সম্বন্ধ অনুযায়ী প্রত্যেকেই বিভিন্ন পরিবেশের অধিকারী। এছাড়া বালক-বালিকা ভেদে এই পরিবেশ আরও বেশী হয়ে থাকে।

পারিপার্শ্বিকের দিক দিয়ে যেমন বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি বংশগতির দিক দিয়েও তারা বংশের বিভিন্ন ধারার উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। তবে কে কোন ধারার উত্তরাধিকারী হবে তা বলা শক্ত। কারণ, বংশ-সত্বাবাহী জীবকোষের মিলনের আগে তাদের অভ্যন্তরে কিছু জটিল পরিবর্তন ঘটে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, প্রত্যেক জীবকোষেই ২৪ জোড়া করে বংশ-সত্বাবাহী কণিকা থাকে। জীবকোষগুলি ভ্রূণাকারে মিলিত হবার আগে, প্রত্যেক জীবকোষ থেকেই সত্বাবাহী কণিকার অর্ধেক অংশগুলি পরিত্যক্ত হয়। মিলনের পরে সে পরিত্যক্ত কণিকাগুলির আবার পূরণ হয়। এখন পরিত্যক্ত হওয়ার কালে প্রত্যেক জোড়ার কোন গুণবাহী কণিকাটি যে বাদ পড়বে এবং কোনটি যে থাকবে তার কোন স্থিরতা নেই। কাজেই মিলনের মুহূর্তে ঠিক যে কণিকাটি বর্তমান থাকবে সেই কণিকাটিই শিশুর শারীরিক বা মানসিক গুণ স্থির করবে। যেমন ধরা যাক গায়ের রঙ। কালো ও সাদা রঙ, এই দুটি সমজাতীয় অসমধর্মী গুণের মধ্যে হয়ত দুইটি জীবকোষের মিলনের পূর্ব-মুহূর্তে কালো রঙের গুণ-যুক্ত কণিকাটি বাদ পড়ে গেল দুটি জীবকোষ থেকেই। বাকী রইল সাদা রঙের গুণ-যুক্ত কণিকাটি। এই সাদা রঙের গুণ-যুক্ত কণিকা দুটির মিলন ঘটলেই একাধারে যেমন ভ্রূণের মধ্যে সাদা রঙের প্রকাশ সম্ভাবনা দেখা যাবে, অন্য দিকে তেমনি বিভিন্ন জীবকোষ দুটি পুনরায় ২৪ জোড়া বংশ-সত্বাবাহী কণিকায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। যে মিলিত জীব-কোষ বা ভ্রূণ থেকে শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাতে মোট ৪৮টির বেশী

বংশ-সত্ত্বাবাহী কণিকা থাকে না, কাজেই যে সত্ত্বাগুলি মিলিত জীবকোষটির মধ্যে রয়ে যায়, শিশুও বংশের সেই সত্ত্বাগুলির অধিকারী হয়। একই পিতামাতার বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন প্রকারের হয় কেন—এইটিই আর একটি অন্যতম কারণ।

পারিপার্শ্বিকের প্রভাব

আমরা আগেই বলেছি যে, অনেকের ধারণা, শিশুর জীবন গঠনে তার পারিপার্শ্বিকই সমস্তটুকু স্থান অধিকার করে রেখেছে। এঁদের মতে দেহের বৃদ্ধি, বুদ্ধির তারতম্য এবং আচার আচরণের বৈষম্য নির্ভর করে, যেমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একটি শিশু মানুষ হয়েছে তার ওপর। অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষার দ্বারা এঁরা নিজেদের মত প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন।

১৯১৩ সালে, ষ্টকার্ড নামে একজন সাহেব মাছেদের ওপর এই পরীক্ষা করেন। তিনি কতগুলো মাছেদের চারা নিয়ে (তাদের তখন চোখ ফোটে নি) একটি বরফের বাক্সের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ধরে বন্ধ করে রেখে দেন। শেষে দেখেন, তারা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করেছে ও তাদের ঠিক মুখের মাঝখানে একটি মাত্র চোখ হয়েছে।

সম-জীবকোষ জাত সন্তানদের নিয়েও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। দুটি মেয়ে পাঁচ মাস যখন তাদের বয়স, তখন তাদের আলাদা করে দুজন আত্মীয়ের কাছে রাখা হয়। একজন থাকে সহরে আর একজন গ্রামে। তাদের বয়স যখন ২৮ বছর তখন আবার তাদের পরীক্ষা করা হয়—দেখা যায়, সহরে মেয়েটি কিছু পড়াশুনা শিখে কোন অফিসে কেরাণীর কাজ করছে, আর অন্য মেয়েটি পড়াশুনা করতে পায় নি, সে কোন একটা খামারে কাজ নিয়েছে। গ্রামের মেয়েটিকে আরো পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, সে সহরের মেয়েটির চেয়ে লম্বায় এক ইঞ্চি বড়, ওজনে ২৮ পাউণ্ড বেশী, কথাবার্তায় বেশী চটপটে আর মেয়েলীয়ানায় পটু। বুদ্ধির পরীক্ষায় সহুরে মেয়েটি অবশ্য বেশী নম্বর পায়।

এই ধরণের আরও কয়েকটি যমজ শিশু পরীক্ষা করেও পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এই সব পরীক্ষা থেকে পারিপার্শ্বিকবাদীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বুদ্ধি, ব্যক্তিগত তারতম্য নির্ভর করে পারিপার্শ্বিকের ওপরেই।

পারিপার্শ্বিকবাদীদের সিদ্ধান্তকে আমরা ততখানি ঠিক বলেই মানতে পারি, যতখানি দাম আমরা দিই মানুষের জীবন গঠনে তার পারিপার্শ্বিককে। পারিপার্শ্বিকের কাজই হল নিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত হবার পথ করে দেওয়া। উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের ফলে গ্রামে-মানুষ মেয়েটির এমন কতগুলো গুণ প্রকাশ পেয়েছে যা উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের অভাবে সহরে-মানুষ মেয়েটির মধ্যে প্রকাশ পেতে পারেনি। আবার সহরে মানুষ হওয়ার জন্য একটি মেয়ের বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য বেড়েছে—গ্রামে থাকার জন্য অন্য মেয়েটির বেলা তা' ঘটতে পারেনি। কাজেই পারিপার্শ্বিকের পার্থক্যের দ্বারা জন্মগত মিলকে ঠিক বদলানো যায় না। ঐ দুটি মেয়েকে যদি পারিপার্শ্বিক বদলে দিয়ে অর্থাৎ সহরের জনকে গ্রামে এনে এবং গ্রামের জনকে সহরে রেখে কিছুদিন পরে পরীক্ষা করা যেত, তাহলে হয়ত ওদের মূলগত মিলটা আরও বেশী করে চোখে পড়ত।

আমাদের করণীয়

যাই হোক বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মতভেদের এলাকা থেকে দূরে সরে এসে যদি আমরা বিচার করতে বসি—তাহলে প্রথমেই আমাদের মনে হবে শিশুর জীবন গঠনে বংশানুক্রমিকতার দান। শিশু কি নিয়ে পৃথিবীতে এল সেটা জানা অত্যন্ত দরকার। ইংরাজীতে একটা কথা আছে "আমরা বরাহীর কাণ দিয়ে সিল্কের টাকার থলি তৈরী করতে পারিনে", কথাটি অত্যন্ত ঠিক। বীজ ভালো না হলে তার থেকে গাছ কখনও ভালো হবে না এত জানা কথাই।

কিন্তু সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হচ্ছে শিশুর সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করা এবং বিকশিত করা। সম্ভাবনা যেখানে বেশী সেখানে তার প্রকাশ কঠিন নয়, কিন্তু যেখানে সম্ভাবনাকে টেনে বার করে আনতে হয় সেখানেই সমস্যা। সেখানেই প্রয়োজনীয়তা আসে পারিপার্শ্বিকের বিভিন্নতার এবং উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক সরবরাহের। তাই আমরা দেখবো, কেমন ভাবে এই পারিপার্শ্বিককে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে শিশুর জীবন গঠনে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগানো যায়।

জন্মপূর্ব পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ

মাতৃগর্ভে থাকাকালীন শিশু মায়ের স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। মায়ের রক্তে যে রাসায়নিক পদার্থ থাকে শিশুর রক্তেও তা সংক্রামিত হয়। অনেকে একথা বলেন যে, মায়ের খাদ্যে শরীর গঠনোপযোগী উপাদানের অভাব হলে শিশুর বুদ্ধি ব্যাহত হয় অর্থাৎ তার মগজের বা কোন কোন গ্রন্থির পুষ্টি হতে পারে না। কাজেই এই সব শিশুকে আমরা ভবিষ্যৎ জীবনে দেখি বুদ্ধিহীন এবং বিপরীত আচরণশীল। মাতৃগর্ভে শিশুর পুষ্টির সময় শিশুকে এই বুদ্ধিহীনতা থেকে বাঁচানো যেতে পারে মাকে পুষ্টিকর ও শরীর গঠনোপযোগী খাবার খাইয়ে।

জন্মোত্তর পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ

ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে শিশুর গৃহ বা যেখানে শিশু বড় হয়, তাই তার পারিপার্শ্বিক। মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও যে সব অভিজ্ঞতা শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে প্রয়োজন সবকিছুর ধারণাই শিশু প্রথমে সে তার এই আপন পারিপার্শ্বিক থেকে সংগ্রহ করে। এই পারিপার্শ্বিক দুই ভাবে শিশুর বিকাশে শিশুকে সাহায্য করে থাকে। প্রথমতঃ শিশুর মনোজগতে—যেখানে অনুভূতি, চিন্তা আর ইচ্ছা কাজ করে চলেছে। দ্বিতীয়তঃ যেখানে শিশুর সঙ্গে বাবা, মা, ভাই, বোন ও

পরিবারের বাইরে আর সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে উঠছে। কথায় বলা হয়ে থাকে যে, এই সময় শিশুর মন থাকে যেন গাছের কচি ডালের মতন; যেদিকে বাঁকাবে সেই দিকেই সে বাঁকবে। কাজেই, শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে এই সময় পারিবারিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আমরা শিশুর নিহিত শক্তির অদল-বদল করতে পারি না সত্য কিন্তু পারিপার্শ্বিককে নিয়ন্ত্রণ করে শিশুকে সমাজের সুস্থ, সভ্য ও প্রয়োজনীয় মানুষ করে তুলতে পারি।

পারিপার্শ্বিক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কয়েকটি ইঙ্গিত

শিশুকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করুন

শিশু যখন বড় হতে থাকে এবং যখন তাকে মানুষ করবার জন্য আমরা উঠে পড়ে লাগি, তখন কতগুলো বিষয়ের দিকে আমাদের নজর রাখা দরকার। অসহায় ভাবটা একটুখানি কাটিয়ে নিয়ে শিশু যখন পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে অল্প অল্প করে—তখনই সুরু হয় তার জীবন। এই সময়ে শিশুর নিজের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা জন্মাতে থাকে। কিন্তু এই আত্মনির্ভরশীলতা অনেক সময় অতিরিক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ফলে চাপা পড়ে যেতে পারে। শিশুর সবকিছু খুঁটিনাটি যদি সব সময়েই অন্য কেউ মিটিয়ে দেয়; তার খাওয়া, পরা, নাওয়া, খেলা-ধূলো ইত্যাদি সব বিষয়েই যদি সে সারাক্ষণই অন্যের কাছ থেকে সাহায্য পায়, তাহলে শিশু যে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়বে তাতে আর সন্দেহ কি? শিশুর জীবনে এই পরনির্ভরশীলতা অত্যন্ত হানিকর। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অসংখ্য রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—আত্মনির্ভরশীল না হলে শিশুর পক্ষে সে সব সমস্যার সম্মুখীন হওয়া খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। ৪।৬ বছর বয়সের বহু সংখ্যক শিশুর ব্যবহার লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, খাওয়া, নাওয়া, পরা, খেলা করা, বেড়ানো, ঘুমানো, ইত্যাদি ব্যাপারে

সেই বয়স থেকেই শিশু আগ্রহশীল এবং এই সব কাজগুলো নিজে নিজে করতেই সে অত্যন্ত পছন্দ করে। কাজেই তার হয়ে সব কাজ করে না দিয়ে, মা যদি তাকে উৎসাহ দেন এবং নিজে পেছন থেকে তার পছন্দ মত তাকে সাহায্য করেন মাত্র, তাহলে দেখা যাবে যে, করার উৎসাহে শিশু খুব মন দিয়েই সে কাজগুলো করবে। এভাবে ছোটবেলা থেকে কাজের ভার নিতে শিখলে শিশু আপনি দায়িত্বশীল হয়ে উঠ্‌বে। তাছাড়া নিজের কাজ নিজেই করতে শিখলে, শিশুর আত্মপ্রকাশেরও সুযোগ হবে। এই আত্মপ্রকাশ শিশুমাত্রেই পছন্দ করে এবং এর ব্যাঘাত হলে শিশুর মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ে।

তবে যদি এমন দেখা যায় যে কোন শিশু কোন কাজ আপনা-আপনি করতে গিয়ে ক্রমাগতই বিফল হচ্ছে ; তাহলে শিশুর মনে আত্মশক্তি সম্বন্ধে নৈরাশ্য আসতে পারে এবং বার বার বিফল হওয়ার দরুণ কাজটির প্রতিও সে বিমুখ হয়ে পড়তে পারে। শিশুর পক্ষে এ ধরণের নৈরাশ্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ছোটবেলার এই ব্যর্থতা, তার মধ্যে 'আমি অন্যের চেয়ে ছোট' এই মনোভাব জাগিয়ে তোলে। নিজের দাম সে নিজেই দেয় কমিয়ে। তার স্বভাবে ভীরুতা আর লজ্জা-প্রবণতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। কোন কাজে সাহস করে এগিয়ে যেতে পারে না—কোন বিষয় সঠিক ভাবে জানলেও চোখ তুলে তা বলতে পারে না। সামান্য সমালোচনাতে বিব্রত হয়ে পড়ে। শিশুর হাবে-ভাবে এ ধরণের নৈরাশ্যের সূচনা দেখলেই শিশুর প্রতি তার অভিভাবকদের মন দেওয়া দরকার বিশেষভাবে। এখানে তাঁদের আরও বেশী করে শিশুর সাহায্যের দিকে এগিয়ে আসা দরকার। অতি সামান্য কাজেই তাকে বেশী করে উৎসাহিত করে এবং তার কৃতিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে প্রশংসা করলে সাধারণতঃ ভাল ফলই পাওয়া যায়।

পরিমিত আদরে শিশুর মন ভরে তুলুন

শিশুমাত্রেই আদর খোঁজে—আর আদর না পেলে মুষড়ে পড়ে। শিশুকে আদর দিয়ে মাথায় চড়ানো যেমন সুবুদ্ধির কাজ নয়—তেমনি আদর থেকে বঞ্চিত করাও নির্বুদ্ধিতার কাজ। তাদের ভালবাসলে এবং তাদের ভালবাসার অংশ নিলে ফল খুবই ভাল হয়; ভালবাসা দিয়ে দুনিয়া জয় করা যায়—আর সবচেয়ে বেশী জয় করা যায় কচি কচি শিশু মনগুলি। শিশু কোন জিনিষ আব্দার করলে সহজে তাকে বিমুখ করা উচিত নয়—কারণ এতে শিশুমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে—আব্দার করে সহজে যা অভিভাবকদের কাছ থেকে পেতে পারে, তা না পেয়ে অন্য পথ খোঁজে পাবার। এতে অনেক সময় চুরি করার ভাবও মনে আসে। তবে অতি আব্দারও ঠিক নয়—এ বিষয়ে অভিভাবকদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, কোন কোন আব্দার মেটালে, আবার কোন কোন গুলোকে বাদ দিয়ে দিলে—মোটামুটি শিশুর পক্ষে শুভকর হয়।

সুঅভ্যাস শিশুর সামনে তুলে ধরুন

ছোটবেলা থেকে শিশুর যাতে কতগুলো ভালো অভ্যাস গড়ে ওঠে সেদিকেও অভিভাবকদের মন দেওয়া দরকার। ঠিক সময়মত সব কাজ করা, জিনিষপত্র সব গুছিয়ে রাখা, যেখানকার জিনিষ সেখানে জায়গামত রেখে দেওয়া, বড়দের কথা শুনে চলা, সঙ্গীদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলা-ধুলো করা, একটা নির্দিষ্ট কাজের সময় অন্য কাজ না করা—যেমন খাওয়ার সময় হলে—বই মুখে বসে না থেকে খেতে যাওয়া, ঝি-চাকরদের সঙ্গে নীচু ব্যবহার না করা—বড়দের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক না করা—নতুন কোন কাজ করতে হলে বড়দের জানিয়ে করা—নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে বাইরে না থাকা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব বিষয়ে ছোটদের বড়রাই সাহায্য করতে পারেন বেশী করে। শিশুমাত্রেই অনুকরণপ্রিয়—বড়দের

যা দেখে অনেক সময় তারা হুবহু তার নকল করে। কাজেই বড়রা যদি নিজেরা এই সব অভ্যাস পালন করে চলেন—তাহলে তাদের দেখে দেখেই ছোটরা শিখবে। অন্ততঃ শিশুর উপস্থিতিতে বড়দের এগুলো সর্বতোভাবে মেনে চলা দরকার কারণ, ছোটবেলায় শিশুচরিত্রে এসব অভ্যাসের ছায়া না পড়লে বড় হলে তাদের ঠিকমত এসব অভ্যাস করানো মুস্কিল। অথচ এসব অভ্যাস না হলেও চলে না। শিশুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের পক্ষে এগুলো সর্ব অবস্থাতেই অত্যন্ত মূল্যবান।

শিশুকে বুঝতে শিখুন

আর একটি বিষয়ে অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখা দরকার। অনেক সময় আমরা শিশুকে না বুঝেই তার বুদ্ধির বিচার করতে বসি। এতে প্রায়ই ভুল করা হয়। এবং এ-ভুল শিশুর পক্ষে খুবই মারাত্মক। যেমন দেখা যাক একটি শিশুর পাঠে অমনোযোগ হিসেব করে। ইস্কুল থেকে হয়ত রিপোর্ট পাঠালে যে, তার পড়াশুনো উচিতমত হচ্ছে না—উন্নতির অভাব ঘটছে। বাড়ীতে তাকে পড়াশুনার জন্য চাপ দেওয়া হ'ল—কিন্তু তাতেও অভীষ্ট ফল পাওয়া গেল না। এর ফলে শিশুর বুদ্ধি সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়ে হা-হুতাশ করা সুরু হল। কিন্তু এখানেই অভি-ভাবকদের সবচেয়ে বড় ভুল। শিশুর বুদ্ধি বিকাশ লাভের ঠিক উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক পাচ্ছে কি না—একথা তাঁরা হয়ত ভাবেনই না। শিশুর পাঠে অমনোযোগ হয়ত পাঠ্যবস্তুর জন্য হতে পারে—(পাঠ্যবস্তু অতি সরল বা অতি কঠিন হলে তা শিশুর পক্ষে সমান ক্ষতিকর)—হয়ত পাঠন দোষে হ'তে পারে; যার ফলে শিশুর শেখার উৎসাহ ব্যাহত হয়েছে—হয়ত বাড়ীর আবহাওয়া ঠিক পড়াশুনো করার মত নয়—চারিদিকে আমোদ প্রমোদ, গান, গল্পের স্রোত বইছে—যার পাশে থেকে শত চেষ্টাতেও শিশু পড়ায় মন বসাতে পারছে না···ইত্যাদি।

শিশুর অসুবিধা ঠিক কোন খানে সেটা জেনে নিয়ে যদি কাজে এগুনো যায়, তাহলে ফল অনেক ভালো পাওয়া যেতে পারে।

শিশু মনকে পাঠানুরাগী করে তুলুন

অমনোযোগী, পাঠভীত শিশুর মনকে পাঠানুরাগী করবার জন্য কতগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। ঠিক পড়বার সময়ে অন্যান্য আকর্ষণগুলো যাতে চারিদিকে ছড়িয়ে না থাকে তাও দেখা দরকার—কারণ, এতে শিশুর মন প্রলুব্ধ হবেই এবং সে তার পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে আমোদ প্রমোদ বা গল্পগুজবে যোগ দেবেই। যদি পাঠ্যবস্তু বুদ্ধির উপযোগী না হয় তাহলে তা বদলানই ভালো। পাঠন-রীতিও বদলান যেতে পারে। গল্প শুনতে শিশু স্বভাবতই ভালোবাসে, কাজেই পাঠ্যবস্তু যদি শিশুর কাছে সম্ভবমত গল্পাকারে উপস্থিত করা যায় তাতে শিশুর মন সহজেই তার দিকে আকৃষ্ট হবে এতে সন্দেহ নেই। দেশবিদেশের কাহিনী সহজ ও হৃদয়গ্রাহী করবার জন্য ছবির আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। নানারকমের ছবি দেখলে শিশুর মন বিষয়বস্তু জানবার জন্য সহজেই আগ্রহান্বিত হয়—ফলে তার পাঠোন্নতিও দেখা যায়।

স্কুলের বাইরে, বাড়ীতেও স্কুলের আবহাওয়া সৃষ্টি করা চলতে পারে। বাড়ীতেই একটা ছোটখাটো স্কুল বসিয়ে তার পড়া, পরীক্ষা এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা করলে অনেক সময় অভিপ্রেত ফল পাওয়া যায়। বাড়ীর ছোট-বড় ছেলে মেয়েদের মধ্যে স্কুল-স্কুল খেলার তাল তুলে দিলে তাদের পড়াশুনোর উৎসাহ বেড়ে যায়। এরই মধ্যে যারা একটু বড় তারা স্কুল তৈরীর নানারকম কাজে সাহায্য করবে আর ছোটরা সেই স্কুলের পড়ুয়া হবে। বাড়ীর বড়দের কাছে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য এদের আগ্রহ বেশীই হবে এবং সেই আগ্রহের ফলে তাদের পড়ার ঝোঁকও বাড়বে। মাঝে মাঝেই সামান্য উন্নতিতে উৎসাহ দেখিয়ে ওদের মনোমত উপহার দিলে ওরা খুবই খুসী হবে এবং পড়ায় আরও বেশী

করে মন দেবে। পাঠের যে সব বিষয় ওদের কাছে বেশী করে কঠিন মনে হয়, সে সব বিষয় অবলম্বন করে খেলার সৃষ্টি করা যেতে পারে। যেমন অঙ্কের খেলা, বানানের খেলা, ভূগোলের দেশ-দেশ খেলা, ইতিহাসের রাজা-রাজা খেলা ইত্যাদি। খেলার গন্ধ পেলেই শিশুর মন নেচে উঠবে এবং সম্ভবমত তাতে যোগ দেবে। ফলে খেলাচ্ছলে বহু দুরূহ বিষয় শিশুর কাছে সরল করে তোলা যাবে।

ছেলে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার উৎসাহ জাগাবার জন্য অনেক সময় বাড়ীতে ছোটখাটো লাইব্রেরী করা যেতে পারে। সেখানে তাদের পাঠের উপযুক্ত নানা ধরণের ছবিওয়ালা চকচকে বই আনলে তাদের মন সহজেই বইয়ের দিকে আকৃষ্ট হবে। বড়দের মধ্যে একজন যদি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে বই-এর শিক্ষাপ্রদ বিষয়গুলি দরকার মত তাদের বুঝিয়ে দেন, তাহলেও তাদের উৎসাহ বাড়ে। এই সব বই পড়ার পর মাঝে মাঝে কে কি পড়ল তাই নিয়ে ছোটখাটো আলোচনা সভা বা বিতর্ক সভা বসালে মন্দ হয় না। এই আলোচনা বা বিতর্কের থেকেই বোঝা যাবে কে কতখানি পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করতে পেরেছে। ছোটদের কোনও বিষয়ে বোঝার ভুল থাকলে এই সময়ে তা সংশোধন করেও দেওয়া যায়। অনেক সময় ঠিক না বুঝলেও নানা ধরণের বই নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে বই সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ে এবং ক্রমে বোঝবারও আকাঙ্ক্ষা জাগে। কাজেই বুঝুক বা না বুঝুক শিশুকে বই নাড়াচাড়া করতে দিতে হয় সব সময়েই—বই ছিঁড়ে ফেলবে এই ভয়ে শিশুর কাছ থেকে বই সরিয়ে রাখলে তার বইতে অনুরাগ না জন্মে বিরাগই জন্মাবে।

শিশুর সৃজনী শক্তি জাগিয়ে তুলুন

শিশুর সৃজনীশক্তি বাড়ানোর ব্যবস্থা করা নানান ভাবে যেতে পারে। বাড়ীতে তাদেরই লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের দ্বারা যদি ছোট ছোট

শিশুর অসুবিধা ঠিক কোন খানে সেটা জেনে নিয়ে যদি কাজে এগুনো যায়, তাহলে ফল অনেক ভালো পাওয়া যেতে পারে।

শিশু মনকে পাঠানুরাগী করে তুলুন

অমনোযোগী, পাঠভীত শিশুর মনকে পাঠানুরাগী করবার জন্য কতগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। ঠিক পড়বার সময়ে অন্যান্য আকর্ষণগুলো যাতে চারিদিকে ছড়িয়ে না থাকে তাও দেখা দরকার—কারণ, এতে শিশুর মন প্রলুব্ধ হবেই এবং সে তার পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে আমোদ প্রমোদ বা গল্পগুজবে যোগ দেবেই। যদি পাঠ্যবস্তু বুদ্ধির উপযোগী না হয় তাহলে তা বদলানই ভালো। পাঠন-রীতিও বদলান যেতে পারে। গল্প শুনতে শিশু স্বভাবতই ভালোবাসে, কাজেই পাঠ্যবস্তু যদি শিশুর কাছে সম্ভবমত গল্পাকারে উপস্থিত করা যায় তাতে শিশুর মন সহজেই তার দিকে আকৃষ্ট হবে এতে সন্দেহ নেই। দেশবিদেশের কাহিনী সহজ ও হৃদয়গ্রাহী করবার জন্য ছবির আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। নানারকমের ছবি দেখলে শিশুর মন বিষয়বস্তু জানবার জন্য সহজেই আগ্রহান্বিত হয়—ফলে তার পাঠোন্নতিও দেখা যায়।

স্কুলের বাইরে, বাড়ীতেও স্কুলের আবহাওয়া সৃষ্টি করা চলতে পারে। বাড়ীতেই একটা ছোটখাটো স্কুল বসিয়ে তার পড়া, পরীক্ষা এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা করলে অনেক সময় অভিপ্রেত ফল পাওয়া যায়। বাড়ীর ছোট-বড় ছেলে মেয়েদের মধ্যে স্কুল-স্কুল খেলার তাল তুলে দিলে তাদের পড়াশুনোর উৎসাহ বেড়ে যায়। এরই মধ্যে যারা একটু বড় তারা স্কুল তৈরীর নানারকম কাজে সাহায্য করবে আর ছোটরা সেই স্কুলের পড়ুয়া হবে। বাড়ীর বড়দের কাছে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য এদের আগ্রহ বেশীই হবে এবং সেই আগ্রহের ফলে তাদের পড়ার ঝোঁকও বাড়বে। মাঝে মাঝেই সামান্য উন্নতিতে উৎসাহ দেখিয়ে ওদের মনোমত উপহার দিলে ওরা খুবই খুসী হবে এবং পড়ায় আরও বেশী

করে মন দেবে। পাঠের যে সব বিষয় ওদের কাছে বেশী করে কঠিন মনে হয়, সে সব বিষয় অবলম্বন করে খেলার সৃষ্টি করা যেতে পারে। যেমন অঙ্কের খেলা, বানানের খেলা, ভূগোলের দেশ-দেশ খেলা, ইতিহাসের রাজা-রাজা খেলা ইত্যাদি। খেলার গন্ধ পেলেই শিশুর মন নেচে উঠবে এবং সম্ভবমত তাতে যোগ দেবে। ফলে খেলাচ্ছলে বহু দুরূহ বিষয় শিশুর কাছে সরল করে তোলা যাবে।

ছেলে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার উৎসাহ জাগাবার জন্য অনেক সময় বাড়ীতে ছোটখাটো লাইব্রেরী করা যেতে পারে। সেখানে তাদের পাঠের উপযুক্ত নানা ধরণের ছবিওয়ালা চক্‌চকে বই আনলে তাদের মন সহজেই বইয়ের দিকে আকৃষ্ট হবে। বড়দের মধ্যে একজন যদি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে বই-এর শিক্ষাপ্রদ বিষয়গুলি দরকার মত তাদের বুঝিয়ে দেন, তাহলেও তাদের উৎসাহ বাড়ে। এই সব বই পড়ার পর মাঝে মাঝে কে কি পড়ল তাই নিয়ে ছোটখাটো আলোচনা সভা বা বিতর্ক সভা বসালে মন্দ হয় না। এই আলোচনা বা বিতর্কের থেকেই বোঝা যাবে কে কতখানি পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করতে পেরেছে। ছোটদের কোনও বিষয়ে বোঝার ভুল থাকলে এই সময়ে তা সংশোধন করেও দেওয়া যায়। অনেক সময় ঠিক না বুঝলেও নানা ধরণের বই নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে বই সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ে এবং ক্রমে বোঝবারও আকাজ্ক্ষা জাগে। কাজেই বুঝুক বা না বুঝুক শিশুকে বই নাড়াচাড়া করতে দিতে হয় সব সময়েই—বই ছিঁড়ে ফেলবে এই ভয়ে শিশুর কাছ থেকে বই সরিয়ে রাখলে তার বইতে অনুরাগ না জন্মে বিরাগই:জন্মাবে।

শিশুর সৃজনী শক্তি জাগিয়ে তুলুন

শিশুর সৃজনীশক্তি বাড়ানোর ব্যবস্থা করা নানান ভাবে যেতে পারে। বাড়ীতে তাদেরই লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের দ্বারা যদি ছোট ছোট

হাতে লেখা কাগজ চালানো যায় তাতে তারা উৎসাহ পাবে খুবই। তারাই নিজের হাতে ছবি এঁকে নিজেদের কাগজ সুন্দর করে তুলতে পারে। এ বিষয়ে বড়রা শুধু তাদের নির্ভুলভাবে শিখতে সাহায্য করবেন। তাদের কাছে মাঝে মাঝে ভালো ভালো রচনা থেকে পড়ে শোনালে এবং তার ঔৎকর্ষ বুঝিয়ে দিলে তারা ভালো করে কিছু লিখবার পদ্ধতিও জানতে পারে। ভালো প্রবন্ধ বা গল্প বা কবিতা হলে যদি তা বাইরের পাঁচজনের কাছে পড়ে শোনাবার ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে সকলেই ভালো লিখতে সচেষ্ট হবে, এতে তাদের রচনাশক্তিও সাধ্যমত জাগাবার সুবিধে হবে। লিখিয়ে বলে যাঁদের নাম আছে, চেনাশুনোর মধ্যে হলে তাঁদের যদি মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করে আনা যায় এই সব শিশুদের আসরে—তাহলে শিশুরা খুবই মন দেবে তাদের রচনা ভালো করে তোলার দিকে। ছোটখাটো শিল্প বা হাতের কাজ করতে উৎসাহ দিয়েও শিশুর সৃজনী শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করা যায়।

মাঝে মাঝে বাড়ীর ও পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একত্র করে সাধারণ অভিনয়ের ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না। অভিনয়ের জোগাড়যন্ত্রের ছোটখাটো কাজের ভারগুলো তাদেরই ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে ফল খুবই ভালো হয়। এই সব কাজের ভার নিয়ে মেতে থাকলে তারা দুষ্টুমি করে বেড়াবার সুযোগ পায় না—আবার অভিনয় করার ভেতর দিয়ে তাদের নানাধরণের শিক্ষাও হয়। পাঠ্যবস্তু অনেকখানি সরস ও আকর্ষণীয় হয়, ফলে তা আয়ত্তেও আসে তাড়াতাড়ি। অভিনয় ক্ষমতা থাকলে তা ছোটখাটো পাঠের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায়। ভালো করে কিছু বলতে শেখাও এর দ্বারা হয়। এই অভিনয় করার ভেতর দিয়ে শিশুর সংগঠনী শক্তিও আস্তে আস্তে ঠিক পথে বাড়তে থাকে। যে সব ছেলেমেয়েদের ছোটবেলায় কাজে উৎসাহের অভাব দেখা যায়—যারা

অত্যন্ত অলস প্রকৃতির হয়—কাজে ফাঁকি দিতে যারা ভালোবাসে এবং কাজকে যারা ভয় পায় তাদেরই ওপর বিশেষ করে এ সব কাজের ভার চাপিয়ে দিয়ে একটু প্রাধান্য দেখাবার সুবিধে করে দিলে অনেক সময় তাদের স্বভাব বদলানোর সহায়তা করে। অনেক লাজুক প্রকৃতির অমিশুকে ছেলেমেয়েরা আর পাঁচটা তাদের বয়সের ছেলেমেয়ের সান্নিধ্যে এসে ক্রমে ক্রমে মিশুকে হয়ে ওঠে—তাদের লজ্জাও আস্তে আস্তে ভেঙে যায়। আবার যারা খুব উদ্ধত, একগুঁয়ে, স্বার্থপর আর হামবড়া ধরণের তারাও নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারে আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের সংস্পর্শে এসে। স্কুলে সাধারণতঃ এ ধরণের সুবিধে সব সময়ে সব ছেলেমেয়ের হয় না। সংখ্যা অতিরিক্ত হওয়াতে যারা খুব উৎসাহী আর উদ্যমী তারাই সব সময় সব কাজে এগিয়ে আসে এবং সব কাজের হাল তারাই ধরে থাকে। যারা লাজুক, বা মিশুকে নয়—কিম্বা যারা উদ্ধত প্রকৃতির, তারা চিরদিনই একপেশে হয়ে পেছনে পড়ে থাকে। বাড়ীতে সাধারণ মত উৎসবাদির ব্যবস্থা করে এদের সব সময়ে উৎসাহ দিয়ে সামনে ঠেলে দিলে এরা কিছু করতে সাহস ও ভরসা পায়। হয়ত প্রথম প্রথম তারা অনেক ভুলচুক করে কিন্তু সে সব স্বীকার করে নিয়েই তাদের উৎসাহ দিতে হয়। এদের লজ্জা ভয় বা জড়তা একবার ভাঙলে এদের দ্বারা অনেক কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কাজও সুসম্পন্ন হতে পারে। আবার যারা উদ্ধত ও অহঙ্কারী প্রকৃতির হয় তারাও কাজের চাপে পড়ে এবং মাঝে মাঝে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনে শুনে তাদের স্বভাব আস্তে আস্তে বদলাতে বাধ্য হয়।

শিশুর আবেগকে ঠিকমত চালনা করুন

শিশুর পারিপার্শ্বিক আলোচনা প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে তার আবেগ ঠিকমত চালনা করা সম্বন্ধে কিছু না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ

থেকে যায়। শিশুর চেঁচানো একটি সাধারণ ঘটনা। এ চেঁচানো অনেক সময় তার রাগ এবং বিরোধী মনোভাবের থেকে আসে। প্রথম প্রথম তার চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলাকে এড়িয়ে চললেই সবসময়ে সেটা ঠিক হয় না। চীৎকার করে কাঁদার সময় শিশু স্বভাবতঃই সস্নেহ সান্ত্বনা খোঁজে। বাপ মায়ের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করা সত্ত্বেও যদি শিশু তাঁদের কাছ থেকে আদর পায় তাহলে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া অনেক সময় নতুন রূপ ধারণ করে। দৈহিক আধি-ব্যাধির জন্য, যেমন দাঁত ওঠার সময়, ঠিকমত হজম না হলে, কাণ ব্যথা করলে, গা চুলকালে শিশু অনেক সময় চেঁচায়। কিন্তু এ চেঁচানোর পেছনেও প্রচ্ছন্নভাবে পিতামাতার প্রতি বিরোধিতার ইঙ্গিত থাকে। তার এই দৈহিক যন্ত্রণার জন্যে যে পিতামাতাই দায়ী এ কথাই তার মনে হয়। কাজেই দৈহিক এই অসুস্থতার সময় মা তার পাশে থাকলে—তাকে সব সময় শুশ্রূষা করলে শিশু অনেকখানি মানসিক শান্তি বোধ করে।

শিশুর মেজাজের কাছে হার মানলে শিশুকে সামলানো খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। সে রাগই করুক বা ভয়ই করুক সব সময়েই সে নিরাপত্তা খোঁজে—এবং পিতামাতাই তার প্রধান নিরাপত্তা স্থল। পিতামাতার পক্ষ থেকে সামান্য দুর্ব্বলতার পরিচয় পেলে তাঁদের সম্বন্ধে খালি তার মনে প্রশ্ন জাগে এবং তার নিজের নিরাপত্তাবোধ ক্রমাগত শঙ্কান্বিত হয়ে ওঠে। এরূপ অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটলে শিশুর মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। এই মানসিক উদ্বেগ শিশুর কাছে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ভবিষ্যৎ জীবনে বহু ব্যক্তির মানসিক বিকৃতির কারণাদি অনুসন্ধান করতে করতে শৈশবের এই মানসিক উদ্বেগের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শিশুর আবেগপ্রবণ জীবন সংগঠন করতে তার পিতামাতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব তাহলে অনেকখানি। নিজেদের ব্যক্তিত্বের

দৃঢ়তার দ্বারা অতি অল্প বয়স থেকেই তাদের মনে জাগাতে হবে নিরাপত্তার আশ্বাস—তাদের কাছে নিজেদের ব্যবহারের দ্বারা প্রমাণ দিতে হবে যে তাঁরা শিশুর নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল। কখনও গাম্ভীর্যে কখনও বা সস্মিত আপ্যায়নে গ্রহণ করতে হবে শিশুর আবেগকে। ক্রুদ্ধ বা ভীত শিশু পিতামাতার গাম্ভীর্যে হবে স্তম্ভিত—আর তাঁদের সস্মিত আপ্যায়নে হবে উৎফুল্ল। এইভাবে কখনও শাসন, কখনও বা আদরের মধ্যে দিয়ে শিশুর আবেগকে নির্দিষ্ট পথে চালিত করতে হবে।

মানসিক বৃদ্ধি ও মায়ের প্রভাব

অতি অল্প বয়স থেকে শিশুর জীবনে মায়ের সাহচর্যের অভাব ঘটলে শিশুর মানসিক গঠন অসম্পূর্ণ এবং তার মানসিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। মায়ের স্নেহ শিশুর জীবনের আবেগকে কতখানি পুষ্টি যোগায় এসম্বন্ধেও আলোচনা করেও দেখা হয়েছে। একবার মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ১৮ মাস থেকে আড়াই বছরের কতগুলি শিশুকে মানুষ করার চেষ্টা করা হ'ল। দেখা গেল এদের মধ্যে ২।১ জন মোটে কথা কইতে শিখেছে। ২।৩ জন ঠিকমত হাঁটতে পারে—পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস প্রায় কারুরই হয়নি। জামা কাপড়ে সময়ে-অসময়ে ময়লা করে। আরও বড় বয়সের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মানুষ হওয়ার দরুণ এবং মায়ের অনুরূপ অন্য কোন মহিলার সাহচর্য এবং স্নেহ না পাওয়ার দরুণ এই সব ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া বা খেলাধূলোয় বয়সানুযায়ী কিছুমাত্র কৃতিত্ব লাভ করতে পারেনি। এই সব ছেলেমেয়েদের যখন পুনরায় মায়ের সান্নিধ্যে আনা হয়েছে, তখন তারা সহজেই এগিয়ে গিয়েছে উন্নতির পথে। মায়ের সান্নিধ্যে এসে তাদের মন উদ্বেগহীন, আনন্দপূর্ণ হয়েছে এবং নিরাপত্তা খুঁজে পাওয়ায় তাদের মানসিক শান্তি অব্যাহত আছে।

শিশুজীবনের প্রথম ৫ বছর অন্তর্মুখী—বাপ, মায়ের স্নেহ তখন তার প্রধান সম্বল। মায়ের স্নেহের জন্য সে সময় তার অসীম আকুলতা—কারণ তার কাছে তার মা-ই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। স্তনদানে মা তাকে আপন থেকে আপনতর করে নেন। যে শিশু মাতৃস্তন পানে বর্দ্ধিত হয়—তার চিত্ত সাধারণতঃ উদ্বেগমুক্ত হয়—এবং জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকে তার কম। আধুনিক কালে জননীরা বোতলে দুধ খাইয়ে সন্তানদের মানুষ করেন। এ ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হ'ল, এতে শিশুর নিরাপত্তা বোধে আশঙ্কা জাগে। মায়ের স্নেহ সম্বন্ধে সে কখনই সঠিক হতে পারে না। ফলে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায়। ভবিষ্যৎ জীবনে বহু ব্যক্তি শৈশবের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই যে ক্রমে ক্রমে বিবিধ মানসিক ব্যাধির কবলে পড়েছেন এবং দুঃসহ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন, এমনও দেখা গিয়েছে।

উপসংহার

শিশুকে মানুষ করার দায়িত্ব ও সমস্যা তার অভিভাবকদের। কাজেই তাকে বোঝার চেষ্টা করা তাঁদেরই সবচেয়ে বেশী দরকার। ব্যক্তিগত বিভিন্নতাকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁদের কাজে এগুতে হবে। শিশুর যা কিছু অন্তর্মুখী সম্পদ তাকে বহির্মুখী করবার জন্য বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করা তাঁদেরই কাজ। তাঁদের কাজ হবে শিশুর বন্ধু হওয়া। শুধু অর্থ থাকলেই যে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করা যায় আর অর্থাভাব ঘটলে সৃষ্টি করা যায় না একথা একেবারে ভুল। চেষ্টা, যত্ন, সহানুভূতি আর ধৈর্য থাকলে অতি সামান্য ব্যয়েও বেশ ভালো পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করা যায়। এজন্য অভিভাবকদের সর্বদা চিন্তা করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। শিশুর মধ্যে নানাভাবে প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে হবে। শিশুকে মানুষ করার যে নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার হচ্ছে তার সঙ্গে তাঁদের

পরিচিত থাকা দরকার—কারণ নতুন দিনে নতুনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে না পারলে তাঁরা ক্রমশই যে পিছিয়ে পড়বেন, এতে সন্দেহ নেই।

সব সময়ে মনে রাখা উচিত যে, শিশুর কাছ থেকে তার সাধ্যাতিরিক্ত ক্ষমতা দাবী করা ভুল। এতে শিশুর জীবনের ঘোরতর ক্ষতি ঘটে। শিশুর কাছে ক্রমাগত বেশীরই দাবী করলে তার ওপর অত্যাচারই করা হবে। বার বার দাবী মেটাতে গিয়ে অসফল হতে হতে শিশুর মন ভেঙে যায়। ফলে সে শিক্ষণীয় বিষয়ের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে, আর অভিভাবকদের ওপরও তার মন হয়ে পড়ে বিমুখ।

আজ স্বাধীন দেশে প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষিত হতে হবে, এটাই সমাজের চাহিদা—রাষ্ট্রের চাহিদা। অভিভাবকেরা কোনও শিশুকে নিয়ে যদি বিশেষভাবে বিব্রত হয়ে পড়েন তা হলে তাঁরা অবিলম্বেই মনোবিজ্ঞানীর শরণ নেবেন। শিশুর মানসিক চিকিৎসার জন্য আজকাল অনেক ক্লিনিক খোলা হচ্ছে—সে সব ক্লিনিকে শিশুর ত্রুটি কোথায় তা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়—এবং তার মানসিক কোন ত্রুটি থাকলে তা বিশেষজ্ঞের দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এই সব বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সর্বদা পরামর্শ করলে শিশুর মানুষ হওয়ার কাজে তাঁরাও অনেকখানি সাহায্য করতে পারেন। যদি অভিভাবকদের পক্ষে শিশুকে মানুষ করা নিতান্তই কঠিন হয়ে পড়ে তা হলে তাদের শিশু-বিদ্যালয়গুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া ভালো—সেখানে শিশু-বিশেষজ্ঞরা শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী তাকে শিক্ষিত করতে পারেন। তবে যে-কোন বাইরের আশ্রয়ের চেয়ে গৃহের আশ্রয় সাধারণতঃ ভালো—কাজেই শিশু-পালন যথাসম্ভব গৃহের শান্ত পরিবেশেই সুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

* শিল্পী
রামকৃষ্ণ দত্ত
অরবিন্দ রায়

* প্রকাশক
সলিল পাল
কিশোর কল্যাণ কেন্দ্র
১৩।২, কাঁটাপুকুর থার্ড বাই লেন
হাওড়া

* মুদ্রক
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৪১, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা - ৬

* সম্পাদক
নির্মল চৌধুরী

* প্রথম প্রকাশ—১৯৫১

দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৯৫৩

* ব্যবস্থাপনা
অনিল সেন

* প্রাপ্তিস্থান
অশোক লাইব্রেরী
১৫।৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ ষ্ট্রীট)
কলিকাতা - ১২

শিশু-লালনী গ্রন্থমালা ✪ শিশু-লালনী গ্রন্থমালা

প্রকাশিত পুস্তিকাবলী

১। শিশু ও শৈশব (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

২। শিশু পালনে কোনটি চাই—
বংশগতি না পারিপার্শ্বিক (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

৩। আপনার শিশু কি লেখাপড়ায়
পিছিয়ে পড়ে ?

৪। কিশোর ও কৈশোর

৫। শিশু অপরাধ ও অপরাধী

৬। শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন (যন্ত্রস্থ)

শিশু-লালনী গ্রন্থমালা

চার আনা মাত্র
প্রতিটির দাম